দৈনিক ইনকিলাব ০৪

তারিখ 11 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1

শিশু শ্রেণী খোলার সুপারিশ

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে শিশু শ্রেণী খোলার যে সুপারিশ করেছে, তাকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী বলে অভিহিত করা যায়। কমিশনের সুপারিশমালায় বলা হয়েছে, শিশু শ্রেণীর জন্যে আলাদা আলাদা স্কুল স্থাপন সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। তাই বিদ্যমান প্রতিটি স্কুলে শিশু শ্রেণী খোলা বা যোগ করার ব্যবস্থা সত্বর করা যায়। স্থানীয় প্রয়োজনে জনসাধারণের আর্থিক, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় যেসব প্রাথমিক স্কুলে শিশু শ্রেণী নেই সেখানেও তা খোলার ব্যবস্থা করা সম্ভব। সুপারিশে আরও বলা হয়েছে, প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার এই দায়িত্ব শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ছাড়াও সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ওপর অর্পণ করা যায়।

শিশুদের সরাসরি প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করার আগে তাদের লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি, বর্ণ ও সংখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানদান, স্কুলে যাতায়াতের নিয়মনীতি শিক্ষা ইত্যাদির জন্যে প্রাক-প্রাথমিক শিশু শ্রেণী খোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে যেসব বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কোনোরূপ পূর্ব শিক্ষা ছাড়া তা পড়া, গ্রহণ ও ধারণ করা শিশুদের পক্ষে অসম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকার কারণে শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েই চোখে অন্ধকার দেখে। একদিকে তাদের অক্ষমতা অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যক্রম শেষ করার তোড়জোড়ের মধ্যে বেশিরভাগ শিশুই লেখাপড়ার প্রতি অনীহ হয়ে পড়ে। অনেকেই পাঠ গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে না। ফলে তাদের ভীত থেকে যায় কাঁচা। এমতাবস্থায় শিশুদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ টেনেটুনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত যেয়েই স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, সেই স্বল্পসংখ্যক শিশুরও বেশিরভাগ কাম্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। দ্রুত শিক্ষা বিস্তার এবং শিশুদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে এ অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক এবং অনভিপ্রেত। স্মরণ করা যেতে পারে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী শিশু শ্রেণী থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে রাজধানী ঢাকাসহ শহরাঞ্চলের কিছু স্কুল ছাড়া গ্রামের প্রায় কোনো স্কুলেই শিশু শ্রেণী নেই। অথচ গ্রামের স্কুলগুলোতেই এর প্রয়োজন সবচে' বেশি।

দেশে আশানুরূপ স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি না পাওয়ার অন্যতম বড় কারণ যে শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিগত ত্রুটি, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, বিগত ৩৬ বছরে স্বাক্ষরতার হার ৫ শতাংশও পড়েনি। ঐ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫১ সালে স্বাক্ষরতার হার ছিল ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ। ১৯৬১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০ দশমিক ৮ শতাংশে। ১৯৭৪ সালে আরও কিছুটা বেড়ে হয় ২৪ দশমিক ২৭ শতাংশ। কিন্তু ১৯৮১ সালে এই হার হ্রাস পেয়ে ২৩ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে আসে। এখনও মোটামুটি এই হারই বহাল আছে। দেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে সাইত্রিশ হাজার সরকারী এবং প্রায় সাড়ে সাত হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পরিতাপের বিষয়, তা সত্ত্বেও শিশু স্বাক্ষরতার হার আশানুরূপ বাড়েনি। কাজেই, শিশু স্বাক্ষরতা ও শিশু শিক্ষার যদি বিস্তার ঘটাতে হয়, তাহলে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা যেমন বাড়াতে হবে বেসরকারী স্কুলগুলোকে সরকারীকরণ কর তে কিংবা অপারগতায় আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে, তেমনি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অবিলম্বে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এটাই আমরা আশা করি।